কবি গুরুর কৃষি ও সমবায় ভাবনা

আব্দুস সালাম তরফদার

জেলা বাজার কর্মকর্তা, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খুলনা ।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন যেমন প্রকৃতি, প্রেম আর মানুষের কবি তেমনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভিার অধিকারী । তৎকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন চিন্তাধারায় তিনি ছিলেন একজন পথ নির্দেশক । পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত বাংলার শিলাইদহ , পতিসর ও শাহজাদপুরের জমিদারী ছিল মূলতঃ বাংলার কৃষিকে কেন্দ্র করে । সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা পদ্মার প্লাবিত পলিমাটিতে সোনা ফলা বাংলার রুপ তিনি প্রতক্ষ্য করতেন হৃদয় দিয়ে । জমিদারী দেখাশুনার সুবাদে তিনি গ্রাম বাংলার নিভৃত পল্লী ঘুরে বেড়িয়েছেন বজরা যোগে । তিনি তাঁর লেখায় বাংলার রুপের নিখুত চিত্রায়ন করেছেন তার কবিতা আর গানে । সাথে সাথে গ্রাম বাংলার দুঃখী মানুষ গুলোকে দু-বেলা দু-মুটো অন্ন জোগানোর প্রয়াস নিয়েছেন তিনি তাঁর কৃষি আর সমবায় ভাবনাতে । তিনি কৃষি উন্নয়ন চেয়েছেন সমবায়ের মাধ্যমে। তাই তিনি কৃষির সাথে সমবায়কে যুক্ত করে কৃষক মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছেন অকপটে ।

কৃষিতে ব্যয় বহুল আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার দরিদ্র কৃষকের পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না একবারেই । সে কারণে তখন তিনি সমবায় ঘঠনের কথা বলেছেন । কবি গুরু প্রতৃতির দান আর মানুষের সৃজনশীল জ্ঞানের যোগসূত্র স্থপানকরে তা কাজে লাগানোর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন । তিনি স্বদেশের কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি শিক্ষার উপর জোর দিতেন । তাই তো তিনি আধুনিক কৃষি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে নিজ পুত্ররথীন্দ্রনাথকে অক্সফোর্ট বা ক্যামব্রিজে না পাঠিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠিয়েছিলেন । যেখানে তিনি কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেন । শুধু কবিগুরুর নিজ পুত্র নয় তাঁর জামাতা নগেন্দ্রনাথ ও বন্ধু পুত্র সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারকেও‘প্রাণি চিকিৎসা’ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য আমেরিকা ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করেন ।

কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর ‘পিতৃস্মৃতি’-তে লিখেছিলেন, ‘’ আমেরিকা যে তিন-চার বছরকলেজে পড়েছিলুম সেই সময় বাবা জমিদারীতে প্রজাদের মধ্যেযে কত রকমের কাজে হাত দিয়েছেন তা আমি কিছুই জানতুম না । বাবা যখন এসব কথা আমাকে বলতেন আমি মুগ্ধ হয়ে শুনে যেতুম । সবশেষে বাবা বললেন, আমি যেসব কাজ করতে চেযেছিলুম কিন্তু এখনও হাত দিতে পারিনি, তোকে সেগুলি করতে হবে- বিশেষতঃ কৃষির উন্নতির চেষ্টা করতে হবে ।‘’ এখানে কবিগুরুর কৃষিকাজের উপর তীব্র অনুরক্ততাবিশেষভাবে প্রতীয়মান হয় । তিনি জানতেন বাংলার কৃষির উন্নতি, কৃষকের উন্নতি তথা সমাজ ও দেশের উন্নতি । তৎকালে শিল্প ও কৃষিশিল্পের কাংখিত অনগ্রসরতা কৃষিকাজকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে ।

(২)

এপার বাংলায় সর্ব প্রথম কবিগুরু শিলাইদহ এলাকাতে কৃষি উন্নয়নে প্রচেষ্টা শুরু করেন । তিনি শিলাইদহ কুঠিবাড়ির আশে পাশের প্রায় ৮০ বিঘা জমি নিয়ে একটি কৃষি গবেষণাগার প্রতিষ্টা করেন । তিনি কৃষকের জন্যে উন্নত বীজ আমদানীর ব্যবস্থা করেন । যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষবাদের ব্যবস্থা করেন । কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি জমিতে রাসায়নিকসার প্রয়োগের পরামর্শ দিতেন । পাম্প বা দমকল দ্বারা তিনি সেচের মাধ্যমে চাষাবাদ করার ব্যবস্থা করেন । একই আদলে তিনি কালিগঞ্জ পরগনার পতিসরে কৃষির উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করেন । পরবর্তীতে তিনি কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি সামগ্রিক কৃষি উন্নয়নের জন্য পল্লীউন্নয়ন মডেল প্রতিষ্ঠার জন্যে শ্রীনিকেতনকে বেছে নেন । আধুনিক কৃষি পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্যে তিনি কলের লাঙ্গল ব্যবহারের পরামর্শ দেন । এছাড়া তিনি চাষাবাদের জন্যে পতিসরে ৭ টি বিদেশী কলের লাঙ্গল আনেন কলকাতা হতে । আমেরিকা থেকে কবিপুত্র রথিন্দ্রনাথ কৃষি বিষয়ে উচ্চতন ডিগ্রী শেষে পতিসরে আসেন । তিনি খামারে ট্রাক্টর চালান, আধুনিক কৃষি খামার প্রতিষ্ঠায় কৃষকদের উৎসাহিত করেন । রথিন্দ্রনাথের কৃষি খামার দেখে আমেরিকা থেকে আগত আইনবিদ মাইরন ফেলপস এতোটাই অবাক হয়েছিলেন যে তিনি একে তৎকালীন মার্কিন কৃষি খামারের মতোই সফল উদ্যোগ বলে বর্ণনা করেছিলেন ।

শুধু কৃষি উৎপাদনই নয় করিগুরু কৃষির বহুমুখী করণের উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । এক ফসলি জমিতে তিনি ২ বা ৩ ফসলী জমি করার উপর উদ্যোগ নিয়েছিলেন । তিনি আমেরিকা হতে ভুট্টা ও মাদ্রাজ হতে চিকন চালের বীজ আমদানী করেন । তাছাড়ও তিনি কপি, সীম পাটনাই মটরশুটি ইত্যাদি চাষের ব্যবস্থা করেন । তিনি শিলাইদহ অঞ্চলে আখ চাষের উদ্যোগ গ্রহণসহ কৃষকদের আখ মাড়াই যন্ত্র স্থাপন করেন । তিনি শুধু শ্রীনিকেতন নয় তার জমিদারী এলাকার প্রতিটি গ্রামে গ্রামোন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন ।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন ভারতবর্ষের দরিদ্র অসহায় স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যে সমবায়ের বিকল্প কোনকিছু নেই । তিনি বলেছেন ‘আমার কাছে মনে হয়, এই কো-অপারেটিভ প্রণালীই আমাদের দেশকে দারিদ্র হইতে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় ।‘’ সমবায়ের গুরুত্ব দিয়ে তিনি আরো লিখেছিলেন---

‘’ মানুষ খাটো হয় কোথায় , যেখানে সে দশ জনের সংগে ভাল করিয়া মিলিতে পারে না । পরষ্পরে মিলিয়া যে মানুষ সেই মানুষই পুরা, একলা মানুষ টুকরা মাত্র ।‘’ সমবায় প্রসংগে তিনি আরো বলেন ‘’ আজ আমাদের দেশটা যে এমন ভীষম গরিব তার প্রধান কারণ আমরা ছাড়া ছাড়া হইয়া নিজেদের দায়একেলা বহিতেছি । ভারে যখন ভাংগিয়া পড়ি তখন মাথা তুলিয়া দাড়াইবার জো থাকে না ।‘’

(৩)

 তিনি আরো বলেন ‘’একা অন্ন ভক্ষণ করা যায় , তাতে হয়তো পেট ভরে । কিন্তু পাঁচজন মিলে খেলে পেটও ভরে আনন্দও মেলে এবং আত্মরক্ষা পায় ।‘’ তিনি সমবায়ের মাধ্যমে শ্রম, সময় ও জমির অপচয় বন্ধ করে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পক্ষে ছিলেন । তিনি সমবায় ভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষিতেঅপেক্ষাকৃত ব্যয় সাপেক্ষ আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর সব সময় উৎসাহ প্রদান করতেন । তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন ‘’তোমরা ৫০ জনে চিরকাল পাশাপাশি পৃথক পৃথক চাষ করিয়া আসিতেছ, তোমরা তোমাদের সমস্ত জমি হাল লাঙ্গল , গোলাঘর পরিশ্রম একত্র করিতে পারিলেই গরিব হইয়াও বড়ো মূলধনের সুযোগ আপনিই পাইবে ।‘’ তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন যে সমবায়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে ।

তৎকালীন সমাজে দরিদ্র কৃষকের অবস্থা বেশ শোচনীয় ছিল । কৃষি উৎপাদনের জন্য তাদের মূলধনের বেশ অভাব ছিল । সে সুযোগে সমাজের এক শ্রেণীর ধনী-মহাজনদের দাদন ব্যবসা ছিল রমরমা । তাদের এ মহাজনী চড়া সুদে কৃষকেরা সর্বশান্ত হতেন । তাদের কষ্ট কবিগুরু হৃদয় দিয়ে অনভব করেছেন । তিনি তাঁর লেখা ‘দুই বিঘা জমি’ –তে উপেন চরিত্র চিত্রায়নের মাধ্যমে মহাজনী শোষনের নিষ্ঠুর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন । সমব্যাথী হয়েছেন গ্রামের এসব দরিদ্র অসহায় কৃষদের সাথে । কবি গুরু মহাজনী ঋণের ফাঁদ থেকে সাধারণ কৃষকদের রক্ষা করার জন্যে ১৮৯৪ সালে তিনি শিলাইদহে প্রথম কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্টা করেন । তারপর তিনি ১৯০৪ সালে পতিসরে সমবায় ব্যাংক ও ১৯২৭ সালে শ্রীনিকেতনে বিশ্বভারতীয় সমবায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্টা করেন । ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর তিনি গরিব সাধারণ কৃষকদের জামানত বিহীন স্বল্পসুদে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করেন । যার ফলে বাংলার দরিদ্র কৃষক কিছুটা হলেও মহাজনী শোষনের হাত থেকে রেহাই পাবার ঠিকানা খুঁজে পায় । বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, কবি গুরুর ১৯১৩ সালের কালজয়ী নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলে তা থেকে প্রাপ্ত ১লক্ষ ৮০ হাজার টাকা তাঁর প্রতিষ্ঠিত কৃষি ব্যাংকের মূলধনের সাথে যোগ করেন ।ফলে তৎকালীন কৃষি ব্যাংকের ঋণদানের সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় । এ কারণে তৎকালীন মহাজনরা অনেকেই তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন । এমন কী এসব মহাজন পতিসরে অবস্থিত ব্যাংকে তাদের অর্থ আমনত করতে শুরু করেন । এ ব্যাংকের কার্যক্রম ১৯২৫ সাল পয়ন্ত চলে । এ প্রসংগে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন ‘’ ব্যাংক খোলার পর বহু গরিব প্রজা প্রথম সুযোগ পেল ঋণ মুক্ত হওয়ার । কৃষি ব্যাংকের কার্যক্রম তখনই বন্ধ হয়ে গেল যখন রুরাল ইনডেটেডনেস এ্যাক্ট প্রবর্তিত হলো । প্রজাদের ধার দেয়া টাকা আদায়ের উপায় রইল না ।‘’

(৪)

কবিগুরুর এ কৃষিভিত্তিক সমবায় ব্যাংকিং মডেলের আদলে কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষকদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে স্বাধীনতা উত্তর সময়ে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

কবিগুরু সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন । প্রজা কল্যাণে কাজ করেছেন সাধ্যমত । জমিদারী প্রথাও অনেক সমালোচিত হলেও তিনি প্রজাদের জন্য অনেকটাই ছিলেন উদার । তিনি গবির প্রজাদের খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে তাদের সক্ষমতাটাকে বিশেষ বিবেচনায় এনেছেন অনেক সময় । মানবিক অধিকারবাদী কবি মনে করতেন জমিদাররা গরীব ও অসহায় চাষীদের শোষন করে বড়লোক হয় , চাষিদের মানবিক মর্যাদা দেয় না । এ প্রসংগে জানা যায় কবি তাঁর জমিদারীর অধিনস্ত এক কর্মচারীকে খাজনা ও কর আদায়ে কৃষকদের প্রতি মানবিক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে পত্রে লেখেন ‘’ প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাপের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায় তহশিল করা শ্রেয় ।‘’

কবি পদ্মার পলি বিদৌত জনপদে কৃষিকে অবলকোন করেছেন হৃদয় দিয়ে । তাঁর “সোনার তরী” কবিতাটি শিলাইদহ অবস্থান কালীন বজারায় বসে লিখেছিলেন । মানব জীবনের অর্জন, পাপ-পূণ্য, অন্তিমযাত্রাসহ পরলৌকিক জগতে প্রবেশের ভাবনাটুকু চিত্রায়িত করেছেন বাংলার কৃষি খামারের সেই শ্রাবণ মাসের পাঁকা আউশ ধানেরসাথে । তিনি জীবনের চাওয়-পাওয়াকে বর্ণনা করেছেন এভাবে ------

 “ গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা ।

কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

রাশি রাশি ভারা ভারা

ধান কাটা হল সারা,

ভরা নদী ক্ষুরধারা

খরপরশা।

কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা। ”

এ ভবে আমরা এসেছিলাম একা, যেতে হবে একাকিত্বেই, সাথে যাবে নিজেরই অর্জিত পূণ্য ছাড়া আর কিছু নয় । নিজের কর্মক্ষেত্র ,নিজের জগত, সৃষ্টির নিয়ম অনুযায়ী তার একান্ত নিজেরই । তাই তিনি লিখেছেন,

একখানি ছোটো খেত, আমি একেলা,

চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।

পরপারে দেখি আঁকা

তরুছায়ামসীমাখা

গ্রামখানি মেঘে ঢাকা

প্রভাতবেলা--

এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

(৫)

অন্তিম যাত্রায় নিজের অর্জনটুকুতেই পরিপূর্ণ জীবন তরী, যেখানে আর কোন কিছুরই ঠাঁই নাই । জীবনের অর্জিত সোনার ধানে পরিপূর্ণ সোনার তরী । পার্থিব আর পরলৌকিব জগতের অপূর্ব আর মোহনীয় বর্ণনা তার ছোট খেতকে ঘিরে তিনি সোনার তরী কবিতাটিতে বর্ণনা করেছেন সহজবোধ্য ভাষায় । বাংলার কৃষি, কৃষক আর তাদের অর্জনকে তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেনতাঁর কবি ভাবনাতে । যাকে কেবল জমিদারীর আদলে নয় তা বরং আবার পার্থিব উপমা হিসেবে রেখে গেছেন বাংলার মানুষের কাছে ।যেমন তিনি লিখেছেন,

“ ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই-- ছোটো সে তরী

আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।

শ্রাবণগগন ঘিরে

ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,

শূন্য নদীর তীরে

রহিনু পড়ি--

যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।‘’

কবিগুরুনিঃসন্দেহে প্রকৃতি প্রেম আর মানবাতার কবি হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন । তাঁর সহস্র সৃষ্টিকর্মের মাঝেও সাধারণ গণ মানুষের কল্যাণে তারঁ সুনিদিৃষ্ট দিক নির্দেশনা মুক্তির পথ খুঁজে পেতে সক্ষম হয়েছে ।আজ আমাদের দেশের কথা যদি ভাবি তাহলে দেখা যায়যে ,দেশ আজ এগিয়েছে অনেক দূর । কৃষিজাত খাদ্যপণ্যে দেশ আজ অনেকটা স্বয়ং সম্পূর্ণ । কৃষকদের ভূমির অধিকার, ঋণ প্রাপ্তির অধিকার, উৎপাদিত কৃষিপণ্য সমুহের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির অধিকার প্রাপ্তিসহ মহাজনী, জমিদারী সামন্ত প্রথা হতে আজকের কৃষক মুক্ত হয়ে দেশের উন্নয়নে কৃষি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে । দেশের প্রতিটি অঞ্চলে আজ অভাবনীয় কৃষির উন্নতি চোখে পড়ার মত । দেশের সার্বিক উন্নয়নে আজ শিল্পের পাশাপশি কৃষি তার অংশীদারিত্বের অকাট্য দাবীদার হিসেবে সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

------------------------------

সূত্রঃ রবীন্দ্র রচনাবলী, রথীন্দ্রনাথ রচিত ‘পিতৃস্মৃতি’ ও কবিগুরু রচিত ‘সমবায় নীতি’